৫

যায়যায়দিন

তারিখ SEP 15 2006

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ব্যর্থ কলেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার

ক'দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট। এবার ভালো রেজাল্টের হার রেকর্ড পরিমাণ। কিন্তু এই রেকর্ডে শামিল হতে পারেনি এক লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৫ জন পরীক্ষার্থী এবং ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কারণ এসব পরীক্ষার্থী যেমন ফেল করেছে তেমনি ব্যর্থ হয়েছে ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও।

দৈনিক যায়যায়দিনের একটি রিপোর্টে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইস)-এর তথ্য মতে সরকারি কলেজগুলোর প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বছরে ব্যয় হয় চার হাজার ৭২২ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে টিচারদের বেতন, নির্মাণ অবকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ, চক-ডাস্টারসহ অনুষঙ্গ সংগ্রহ।

এছাড়া বেসরকারি কলেজগুলোতে টিচারদের বেতন-ভাতার শতকরা ৯০ ভাগ সরকারি অংশ, উপবৃত্তি, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অনুদানসহ মাথাপিছু ব্যয় হয় চার হাজার ১৯ টাকা। দেখা গেছে, সরকারি ও বেসরকারি কলেজের পরীক্ষার্থীর পেছনে গড় হিসাবে দুই বছরে সরকারের-খরচ প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা।

অন্যদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জানা গেছে, এবারের এইচএসসিতে ফেল করা প্রায় পৌনে দুই লাখ পরীক্ষার্থীর পেছনে বছরে গড়ে ছয় হাজার হিসেবে দুই বছরে অভিভাবকদের খরচ হয়েছে ২১০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ফেল করা এসব ছাত্রের জন্য অভিভাবক ও সরকারের ব্যয় হয়েছে তিনশ' কোটি টাকার বেশি।

এই বিশাল অঙ্কের অর্থ ও মূল্যবান সময়ের অপচয়ের জন্য শুধু ছাত্রদেরকে এককভাবে দায়ী করা চলে না। এর জন্য একই সঙ্গে দায়ী অযোগ্য টিচার, স্টুডেন্টের প্রতি তাদের অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব ও আন্দোলন-সহিংসতা, টিচার স্বল্পতা এবং অভিভাবকদের অসচেতনতা। এসব একশ' ভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য।

জানা গেছে, ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক বা দুই বছর আগে। ধরাধরি বা সরকারের ওপর মহলের তদবিরে নিয়মবহির্ভূতভাবে এগুলো বোর্ডের অনুমতি পেয়েছে। একই এলাকায় খুব কাছাকাছি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান পাওয়ার জন্য নানা অপকৌশলের আশ্রয়ও নেয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় ফেলের হার কমানো এবং শূন্য পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলঙ্ক থেকে দেশকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের উচিত হবে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। যেসব প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য তাদের সরকারি অনুমোদন প্রয়োজনে বাতিল করতে হবে। ফেলের সংখ্যা বেশি এমন প্রতিষ্ঠানকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়ে সতর্ক করতে হবে এবং নতুন কোনো স্কুল-কলেজকে অনুমোদন দেয়ার আগে সত্যিই সেগুলো অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য কিনা সে ব্যাপারে অবশ্যই যথাযথ অনুসন্ধান চালাতে হবে।